বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন

শমিত দাস

বাংলার নবজাগরণে শীর্ষস্থানীয় মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনকে এমন একটা জায়গায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন যেখানে ধর্ম, ভাষা এবং জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষ মুক্ত রূপে নিজেকে দেখতে পারে আর সেই দেখতে পাওয়াই হবে নতুন যুগকে পাওয়া। আর এই নতুন যুগের সূচনার সঙ্গে বহু মানুষ আবর্তকের মধ্যে আশ্রমের স্থাপত্য পরিকল্পনা এক গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক।

শিল্প সংস্কৃতির স্বদেশিয়ানা ও ভারতীয় চিন্তায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সূচনা কেন্দ্র হিসেবে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ি বা ৫নং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। যে বাড়িতে এসেছিলেন ওকাকুরা, তাইকান, রদেনস্টাইন, সিস্টার নিবেদিতা ও আরো অনেকে। দেশি, বিদেশি গুণীজনের পদধূলিতে এই বাড়ির অনুভূতি এক গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছিল বাংলার নবজাগরণে। এবং সেই স্রোতের বিস্তার ঘটেছিল ৬নং জোড়াসাঁকো বাড়ি ও পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়িতে। এ ক্ষেত্রে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বাড়ির বিভিন্ন মানুষজনের ভূমিকা খানিকটা আলোচনার বাইরে থেকে গেছে। যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সৌতিন্দ্রমোহন ঠাকুর (ভাস্কর্য পৃষ্ঠপোষকতায়), সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে), প্রফুল্লনাথ ঠাকুর (শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায়), প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (আসবাব, আভ্যন্তরীণ সজ্জা ও দিশি অলংকরণের ব্যবহারে)। সঙ্গে আরও বহু নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ সেই সাংস্কৃতিক প্রবাহকেই এগিয়ে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর আশ্রম শান্তিনিকেতন বা 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের যুগে গতানুগতিক শহুরে বিদ্যালয়ের নিয়ম ছাড়িয়ে এই আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল। প্রথম দিকের বিশ্বভারতী বলতে আমরা যে প্রাতিষ্ঠানটিকে বুঝি তা বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তর শান্তিনিকেতনের একটি ছোট্ট বিদ্যালয় রূপে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে শুরু ১৯০১-এ। এর আগে আশ্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত একটি মাত্র অতিথিশালা ভবন ছিল ব্রহ্মোপাসনার জন্য— 'শান্তিনিকেতন' (১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে)। পরে এর সঙ্গে আশ্রমে প্রকৃতির অবাধ বিস্তৃতি। আর বীরভূমের সেই বিশাল প্রান্তরে গড়ে উঠেছিল বাংলার নবজাগরণের আর এক পীঠস্থান, যার উদ্দেশ্য ছিল জীবনভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রতি সচেতনতাবোধ।

আশ্রমের এই বিস্তীর্ণ প্রকৃতিকে কবি কখনই খণ্ডন করতে চাননি, বরং একে শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগের সূত্র প্রাচীন ভারতে গুহামন্দিরেও দেখতে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন রূপের এক নব্য সংস্করণের ভিত্তি ছিল আশ্রমে স্থাপত্যের আদর্শ। কারণ রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রথাগত (তৎকালীন সরকারি) শিক্ষা ব্যবস্থার সপক্ষে ছিলেন না। তাঁর নিজের জীবনেও এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধ তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সেই সব অসম্পূর্ণতাকে মনে রেখে তৈরি করেছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। সেই আশ্রম ও তার আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকের প্রয়োজন ছিল, আর তা হল স্থাপত্য পরিকল্পনা।

রবীন্দ্র সাহিত্য প্রকৃতির ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে এসেছে যা ব্যক্তিসত্তা থেকে বিশ্বসত্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর আশ্রমে স্থাপত্য অবকাশের ভাষা মারফত। এই স্বপ্নের স্থাপত্য বাস্তবে রূপায়িত করতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বহু ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সুরেন্দ্রনাথ কর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যাট্রিক গেডেস, সি এফ এন্ড্রুস, আর্থার গেডেস, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর ও নির্মাণে বীরেন্দ্রমোহন সেন। গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর এই কাজে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। যদিও প্যাট্রিক ও আর্থার গেডেস ছাড়া কেউই প্রথাগত স্থাপত্য বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না।

কবির স্থাপত্য - ভাবনায় এক গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক অবকাশ (Space) ভাবনা। সেই অবকাশ ভাবনার সঙ্গে তিনি প্রকৃতির বিমূর্ত রূপকে একাত্মরূপে দেখেছিলেন। এই বিমূর্ত ভাবনা তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যেও পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য এক প্রবন্ধের অংশ বিশেষে থেকে:

'আজ শ্রাবণের অশান্ত ধারাবর্ষণে জাগতে আর যত কিছু কথা আছে সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাটির মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড় এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে। বৃষ্টি পতনের এই অবিরাম শব্দ। এ যেন শব্দের অন্ধকার।'[২]

আশ্রম পরিকল্পনা

প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক এবং দৈনন্দিন জীবনধারার এক সরলীকৃত অবকাশের চিন্তা করেছিলেন কবি তাঁর আশ্রমের স্থাপত্য পরিকল্পনায়। যেখানে বাহ্যিক প্রাচুর্য, দাম্ভিকতা ও অহংবোধকে একেবারেই স্থান দেননি। ধূসর রুক্ষ প্রান্তরকে সজীব করে তুলেছিলেন এক ভিন্ন দর্শনের ভিত্তিতে। যেখানে প্রকৃতি ও আশ্রমের অবকাশ ভাবনার কোনও বিরোধ তৈরি হয়নি। আশ্রমের ভাবনার আম্রকুঞ্জ, শালবীথি, মাধবীবিতান ছাতিমের উপস্থিতি কখনও এক অপরের অহংবোধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল না, বরং তা ছিল এক যুগ্ম দর্শনের চিত্র যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কবির এই সচেতনতার প্রকাশ তাঁর একটি লেখার অংশ বিশেষ থেকে আরও স্পষ্ট হয়—

'আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে।

...এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা

ছিল যে শান্তিনিকেতনের গাছপালা পাখি এদের ভার নেবে।

...তাই আমার মনে হয়েছিল যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার একটি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।'[৩]

শান্তিনিকেতনে দিগন্তের অনুভূমিক বিস্তারের

[২]শান্তিনিকেতন; শ্রাবণসন্ধ্যা; রবীন্দ্র রচনাবলী; বিশ্বভারতী (সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭।

[৩]রবীন্দ্র প্রসঙ্গ; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; বিশ্বভারতী, ১৪০৬, পৃঃ ৫৬।

কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের সামগ্রিক রূপকল্পনা করেছিলেন ও সামঞ্জস্য রেখেছিলেন স্থাপত্য পরিকল্পনাতেও। যে পরিকল্পনার কথা ভাবতে গিয়ে খনন করেছিলেন প্রাচীন ভারতের শিল্প ও ইতিহাসের শিকড়কে। সেই আদি সূত্রের ভিত্তিতেই পর্যালোচনা করেছিলেন সমসাময়িকতা ও তাঁর নতুন চিন্তা ভাবনাকে বিশ্বভারতী মারফত বিশ্বের দরবারের পৌঁছে দিয়েছিলেন।

স্বপ্ন ও বাস্তব অবকাশের দূরত্বকেও তিনি মনের কোণে স্থান দিয়েছিলেন যেখান থেকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম। যার প্রারম্ভিক সূত্র ছিল জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা সভা। সেই সময় আশ্রমের এই কর্মযজ্ঞে সুরেন্দ্রনাথ কর বা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কাজ করতে হয়েছিল খুব সীমিত আর্থিক সঙ্গতির কথা মাথায় রেখে। যে কারণে আশ্রমের বহু বাড়ি একসঙ্গে তৈরি সম্ভব হয়নি বা রূপের পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু কোনও বাড়িতেই এই ব্যবধানের প্রভাব বোধ হয় না বরং বিভিন্ন তলের সংঘবদ্ধতা চিত্র/ ভাস্কর্যের রূপের পরিচয় দেয়।

মূলত দু' ধরনের স্থাপত্যের প্রকাশ ঘটেছিল আশ্রমে। প্রথমত বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠানগত বাড়িঘর ও দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আবাসগৃহের সমষ্টি। প্রাতিষ্ঠানিক ও কবির ব্যক্তিগত আবাসগৃহের মূল দর্শন ছিল প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ও জ্ঞানচর্চা সহায়ক পরিবেশ। এর সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ইমারতের ক্ষেত্রে মনে রাখা হয়েছিল সমষ্টিগত আন্তরিকতার অনুভূতি। কবি ব্যক্তিগত আবাসের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনাতেও ঘটেছিল একক অবকাশের অনুভূতি।

আশ্রমের কোনও বাড়িঘরই তার উপস্থিতির অহংবোধের প্রকাশ ঘটায়নি। স্থাপত্যের এই নিরাভরণ রূপ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা অনন্য। এ ব্যাপারে তিনি তৎকালীনপরিবেশবিদ প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গেও আলোচনা/ পত্রালাপ করেছিহেন যার এক ছোট্ট অংশ এখানে উল্লেখ করা হল:

'Your ides of graphic representation of the growth of human life & mind, the cycle of their activities & and varied manifestation has strongly captured my mind. I wish we could make place of it in our instiution."[৪]

প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও তাঁর প্রতিনিয়ত ক্ষয়ের কথা মনে রেখে স্থাপত্যের নির্মাণ কৌশল ও তাতে প্রয়োজনীয় মালমশলা ব্যবহারের ব্যাপারে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন মানুষজনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রতিমা দেবীর লেখা এক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

[৪]২৮ ডিসেম্বর ১৯২২; মূল চিঠি সংরক্ষিত; রবীন্দ্র ভবন, শান্তিনিকেতন।

'গৃহ নির্মাণের এক নতুন কৌশল আমরা পরীক্ষা করেছি শান্তিনিকেতনে। কাদামাটির সমতল ছাদ তৈরি করে দেখা গেছে প্রবল বৃষ্টিতেও তার ক্ষতি হয় না। শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের আবিস্কৃত এই পদ্ধতি অত্যন্ত সফল হতে দেখা গেছে। এই পদ্ধতিতে তৈরি একটি বাড়িতে গুরুদেব এখন বাস করতে শুরু করেছেন। গ্রামবাসীদের অনেকে সে বাড়ি দেখে অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করছে। আমাদের আদর্শের সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যৌথ জীবনযাত্রার ধর্মাচরণের প্রয়োজন এবং সুবিধাও কিভাবে যুক্ত করা যায়, সে কথা ভাবতে হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যৌথ জীবনযাত্রার ধর্মাচরণের প্রয়োজন এবং সুবিধা কিভাবে যুক্ত করা যায়, সে কথা ভাবতে হবে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য এক মন্দির থাকবে। যেখানে কোন মূর্তি বা কোন বিশেষ ধর্মীয় প্রতীক থাকবে না। সেখানে সকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রার্থনা করবে। ধ্যান উপাসনা করতে পারবে। কোনও পুরাতন গ্রামে এসব নতুনত্ব সম্ভব হবে না। জমিদাররাই সেখানে প্রথমে বিরোধিতা করবে তারপর গ্রামবাসীরা। আমাদের নতুন গ্রামে ভাবনা নিশ্চয়ই সফল হবে, কেননা তার একটি বাস্তব ও জরুরী প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রতিবেশী, গ্রামবাসীদের কাছে তা একটা জীবন্ত শিক্ষা ও দরকারী উদাহরণ হয়ে থাকবে। সমস্ত বাঁধা ধরা কাল্পনিক যান্ত্রিক শিক্ষার ঊর্ধ্বে সে গ্রাম হয়ে উঠবে এক প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান। শহরের স্বাভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠবে এই গ্রাম।'[৫]

বীরভূম জেলার তপ্ত গ্রীষ্মের প্রখর তাপের কথা মনে রেখে আশ্রমের বহু বাড়ির চারিদিকে প্রচুর খোলা জায়গা রাখা হয়েছিল। বাড়ির সামনে খোলা বারান্দা (চাতালের মতো), টানা বসবার জায়গা যুক্ত করা হয়েছিল। এই উন্মুক্ত চাতাল ও তাতে বসবার ব্যবস্থা ভারতের প্রাচীন গুহামন্দিরে ও প্রাচ্যের বহু মন্দিরে দেখা যায়। কিন্তু আশ্রমে এর ব্যবহারকে এমনভাবে করা হয়েছিল যা প্রাচীনকে অনুকরণ নয়, সেই নির্যাস থেকে এক নতুন সংযোজন। ভারতের পরিবেশ ও স্থাপত্য সংক্রান্ত এই নতুন সংযোজনের দার্শনিক চিন্তাভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম পথপ্রদর্শক। অন্যদিকে, প্যাট্রিক গেডেসের পুত্র আর্থার গেডেসের গভীর গবেষণার ফসল শ্রীনিকেতনের বাড়িঘর ও পারিপার্শ্বিক পরিকল্পনা। শ্রীনিকেতনের শিক্ষকদের কোয়ার্টার পরিকল্পনায় তাঁর অসামান্য অবদান।

[৫]স্মৃতিচিত্র (আধুনিক গ্রাম); প্রতিমা দেবী; দে'জ পাবলিশিং; ১ম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, নতুন সংস্করণ ২০০৭, পৃঃ ৩১৭।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ক্রমবিকাশমান সৌন্দর্য চর্চার অনুকূল পরিবেশ শিক্ষারই এক অঙ্গ ছিল, যা কোনও বিলাসিতা নয়। জ্ঞানচর্চা সহায়ক পরিবেশের নিজস্ব তাগিদেই আশ্রমে বিভিন্ন বাড়িঘরের অবস্থান ও তার নান্দনিকতার কথা ভাবা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের বাড়িঘরে বারান্দা ও চাতাল তৈরির কারণ সমষ্টিগত মিলনের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের কথাই বলে। গাছের তলায় চাতাল বা বাঁধানো চত্বরের ব্যবহার মোঘল স্থাপত্যের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। যাকে 'Achabal'

বা 'চবুতর' বলে। আশ্রমে স্থাপত্য নির্মিতির এক বিশেষ দিক হল বিভিন্ন তলের সহাবস্থান ও জানালায় সরদলে সামান্য অলংকরণ যা এই বাড়িঘরের মধ্যে অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। জানালায় সরদল অলংকরণের সঙ্গে বিজাপুর ইব্রাহিম রওজার অলংকরণের সাযুজ্য রয়েছে। কোনও জানলাতে প্রায় গরাদের ব্যবহার নেইই ও পরিমাপে প্রায় দরজার মতো। চুরি-ডাকাতির কোনও প্রশ্ন ছিল না বলেই হয়তো তা সম্ভব হয়েছিল।

শিক্ষার স্থাপত্য

প্রাতিষ্ঠানিক ইমারতের আদিরূপ আশ্রমে গাছের তলায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেখানে মাথার ওপর প্রাকৃতিক আবরণ (গাছের ছায়া) ছাড়া চারিদিক খোলা। আশ্রমে শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক অভিনব আঙ্গিক- ছাত্রদের এক উন্মুক্ত দর্শনের সামনে মেলে দেওয়া হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ অবকাশের কথা মাথায় রেখেই হয়তো আশ্রমে বিদ্যালয় ভবন ও ছাত্রাবাসে বড় বড় জানালা ও দরজার ব্যবহার করা হয়েছিল।

পুরনো কলাভবন ছাত্রাবাসে কক্ষের পরিকল্পনা প্রাচীন ভারতীয় গুহামন্দিরের চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমে থাম সংলগ্ন বারান্দা। বারান্দার দেওয়ালে তৎকালীন ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ভিত্তিচিত্র ও ছাদে রয়েছে শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আঁকা তৎকালীন বীরভূমের গ্রামীণ জীবনের ভিত্তিচিত্র। এর অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অজন্তা গুহার অনুভূতি বেশ জোরালো। কলাভবন ছাত্রাবাস ও অজন্তা গুহা মন্দির, উভয়েরই ক্ষেত্রে ভেতরে তিনদিকে ঘর ও তার ভেতরে ছোট ঘর ও বারান্দায় বসার ব্যবস্থা রয়েছে। সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের এ এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। সমষ্টিগত ভাব আদান প্রদানেরও এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এই অবস্থানকে। ১৯১১ সালে বিদ্যালয়ে কিছু নতুন ঘরের সংযোজন হয়েছিল। যার নাম 'বীথিকা গৃহ' ও 'বাগান বাড়ি'। বীথিকা ছিল শালবীথির দক্ষিণে। বাগানবাড়ি ছিল পুকুর পাড়ে। আজ যদিও এই বাড়িগুলোর কোনও অস্তিত্ব নেই, আশ্রমে এটা বাংলার গ্রাম্য কুটিরের এক অন্য সংস্করণ ছিল। ১৯১১-১২ সালে আরও চারটি কুটির তৈরি হয় - তান কুটির, মোহিত কুটির, সত্য কুটির, পরে শমীন্দ্র কুটীর।[৬]

[৬] শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; বিশ্বভারতী; আষাঢ় ১৪০৭, পৃঃ ৫৪

পুরনো গ্রন্থাগারের কাছে বৌদ্ধ স্তুপের আদলে তৈরি ঘন্টাতলা এক অসামান্য সংযোজন ছিল পারস্পরিক ধারাকে ব্যবহারিক দিকে প্রয়োগ করে। আশ্রম ও মন্দির পরিচালনার সূচক হিসেবে এই ঘন্টার ব্যবহার। নতুনকে গ্রহণ করার আর এক উদাহরণ হল পুরনো গ্রন্থাগারের গঠন। দোতলা এই বাড়ির একতলায় দুটি স্তম্ভের ব্যবহার হয়েছিল, যা দৃশ্যগতভাবে জোরালো এবং কাঠামোর ক্ষেত্রেও এই ভাব প্রযোজ্য। জ্যামিতিক আকারের মধ্যে এই আলংকারিক ব্যঞ্জনা পুরনো গ্রন্থাগারের চরিত্রে শান্ত, স্মিত রূপের অনুভূতি। একই বাড়িতে দোতলায় দু' পাশে দুটি টালির ছাদ দেওয়া ঘর আছে যাকে 'বলভী কুটির' বলা হয়। বাংলা খড়ের চালা আকৃতিকে প্রয়োগ করে এক নতুন সংস্করণ হয়েছিল এই পাকা বাড়ির ক্ষেত্রে। এই বাড়ির এক তলায় বারান্দাতে নন্দলাল ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের করা ভিত্তিচিত্র রয়েছে। প্রত্যেক দরজার উপরে ভিত্তিচিত্র আঁকার আগে রবীন্দ্রনাথ কিছু কথন লিখে দিতেন নন্দলালকে, যা বোধহয় কাব্য ও চিত্রের এক বিমূর্ত রূপ। পরে এই কবিতাগুলি 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে 'দুয়ার' নামে সংযোজিত হয়েছিল।[৭]

[৭] ভারত শিল্পী নন্দলাল; পঞ্চানন মন্ডল; দ্বিতীয় খণ্ড; রাঢ় গবেষণাকেন্দ্র; দোলযাত্রা, মার্চ ১৮৮৪, পৃ: ৪৩০৮৩১।

[৮] দীপেন্দ্রনাথের চিতাভস্মের অংশবিশেষ এখানে রাখা হয়েছিল; পরিকল্পনা নন্দলাল বসু; ভারতশিল্পী নন্দলাল, প্রথম খণ্ড; পঞ্চানন মণ্ডল; রাঢ় গবেষণা পর্ষদ, শান্তিনিকেতন ১৯৮২, পৃ: ৫২৫।

গৌর প্রাঙ্গণের মধ্যেও এক সরল জ্যামিতিক কাঠামো দেখা যায় যার নাম সিংহসদন সঙ্গে পূর্বতোরণ ও পশ্চিমতোরণ। এর দু'পাশে বৃত্তাকার ছত্রি যা পঠনপাঠনের কাজে ব্যবহার হয় আজও। পূর্বতোরণ ও পশ্চিমতোরণ একবারে তৈরি হয়নি। এই কাঠামো ভারতীয় সরল জ্যামিতিক অলংকরণের এক প্রামাণ্য উদাহরণ। সঙ্গে দ্বিসমাত্রিক অলংকরণের ব্যবহারও রয়েছে। এই বাড়ির সম্মুখবর্তিতার সঙ্গে উত্তর ভারতে জৌনপুরের অটালা দেবী মসজিদের এক অদ্ভুত দৃশ্যগত মিল দেখা যায়।

শুধু মানুষ নয়, আশ্রম স্থাপত্যে পশু-পাখিদের কথাও ভাবা হয়েছিল। গুরুপল্লীতে (নিচু বাংলার কাছে) রাস্তার পাশে বাংলা পোড়ামাটি মন্দিরের আদলে পাখিদের জন্য জলের ব্যবস্থা, যার ওপরটা দেখতে পদ্মফুলের মতো। এটি তৈরি হয়েছিল দীপেন্দ্রনাথের স্মরণে।[৮] আবার পুরনো পান্থনিবাসের পাশে (বর্তমান সুবর্ণরেখা বইয়ের দোকান) যাত্রীবাহক গবাদি পশুদের জন্য ছিল জলাধার, যা শুধুমাত্র অলংকরণ নয়, ব্যবহারিক পরিকল্পনার এক যথাযথ সমন্বয়। আশ্রমের কিছু জায়গায় দ্বারের ব্যবহার ও তার দু'পাশে স্তম্ভ রয়েছে। এর ওপরের অংশে রয়েছে কোথাও পদ্মফুলের আকৃতি আবার কোথাও দেশজ ফুলের কুঁড়ির আকৃতি, যা পারস্পরিক ভারতীয় অলংকরণের পরিচয়।

শান্তিনিকেতনে বাড়িঘরের সঙ্গে আর এক অদ্ভুতপূর্ব সংযোজন হল শিল্পী রামকিঙ্করের ভাস্কর্য। উন্মুক্ত পরিবেশে এইসব ভাস্কর্যের অবস্থান প্রকৃতি ও স্থাপত্যের মাঝে সুন্দর সেতু রচনা করেছিল। ভাস্কর্য ও রিলিফ সম্বলিত কালো বাড়ি (কলাভবন এলাকায়) এক অনন্য সংযোজন যা কলাভবনের স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রাবাস। মনসংযোগে সাহায্যকারী এর আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা।

শান্তিনিকেতনে বিশেষ অতিথিদের জন্য তৈরি অর্ধচন্দ্রাকৃতি একতলা 'রতনকুঠি' বীরভূমের বিস্তীর্ণ দিগন্তকে ভেবে তৈরি। এই বিশেষ আকারের জন্য বাড়ির উপস্থিতি কখনই মাটি থেকে সরে আসেনি। প্রত্যেক ঘরের সামনে আছে বারান্দা। এই বারান্দায় বসলে কোনও অতিথির একাত্মতায় হস্তক্ষেপ করে না, এমনই অভিনব এই পরিকল্পনা। প্রথম পর্যায়ের শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাঠামো ও সার্বিক পরিকল্পনায় প্রকৃতি ও খোয়াইয়ের ছন্দকে কখনই অস্বীকার করা হয়নি। আম্রকুঞ্জ বা শালবীথিও এই ছন্দের এক অন্তরঙ্গ রূপ।

সেই সময়কার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ভবন হল কলাভবনের পুরনো 'নন্দন বাড়ি', 'হ্যাভেল কক্ষ' সংলগ্ন। এই হ্যাভেল কক্ষে এক সময় শিল্পের প্রদর্শনীও হত। প্রদর্শনী উপস্থাপনায় ভীষণভাবে স্বকীয়তার পরিচয় ছিল। ছবি উপস্থাপনার অলংকরণ প্রক্রিয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে নেওয়া হয়েছিল। কারণ, ভারতীয় প্রথায় ছবিকে নতুনভাবে পরিবেশনের এ এক অভিনব দিক (যার সূত্রপাত হয়েছিল জোঁড়াসাঁকোর বাড়ি থেকেই)। নন্দন বাড়ির আর এক লক্ষণীয় বস্তু হল বাড়িতে ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশের দ্বার ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (এখন সেখানে ছাপাই ছবির স্টুডিও)। এর প্রধান হল ঘরের দু'পাশ দিয়ে দুটি ফাঁপা স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে উত্তর-দক্ষিণমুখি হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা। ঘরের ভেতরে মেঝের ওই ফাঁপা স্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত যা দিয়ে হাওয়া প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজেই সম্ভব ছিল। সেই কারণে গরমকালে গরম হাওয়া চলাকালীন সমস্ত জানালা বন্ধ রেখে এই প্রবেশদ্বার দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢোকানো যেত, ফলে ঘরে ঠান্ডা থাকত। এই ব্যবস্থা মধ্যপ্রাচ্যে মরুভূমির গরম হাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করা হত। এবং একই হলে সরাসরি সূর্যের আলো প্রবেশের ব্যবস্থাও ছিল, যা রবীন্দ্রনাথ জাভার রাজপ্রাসাদে দেখে রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে আশ্রমে এর প্রয়োগ করতে বলেছিলেন। একমাত্র এই বাড়িতেই জানালার ওপরে একই আকারের আরও জানালা ছিল। আলো ও প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের এ এক সুগম মাধ্যম। সঙ্গে ওপর থেকে অন্যান্য ঘরে আলো প্রবেশেরও ব্যবস্থা ছিল। সেখানে আলো যাতে সরাসরি নিচে আসে তার জন্য খোপগুলির নিচের অংশে ঢাল তৈরি করা হয়েছিল। পরের দিকে সোমনাথ হোড়ের দেওয়ালচিত্র এক সংযোজন, সেখানে বিশ্বশক্তি স্ফূরণের কথা বর্ণিত।

আলাপে আড্ডায়

আলাপ, আলোচনা ও আড্ডার মাধ্যমে শিক্ষা শান্তিনিকেতনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং এই কথা মনে রেখে এক অসামান্য স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল বেণুকুঞ্জের পাশে, দিনান্তিকা চা চক্র'। বাড়িটি দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে তাঁর স্ত্রী নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই অষ্টভুজাকৃতি ঘর মাটির একটু উঁচুতে, কিন্তু দোতলার মতো উঁচু নয়। এই ঘরের চারিদিকে জানালা ও বসার বেদি রয়েছে। ঘরের ভেতরের অংশ নন্দলাল বসুর ভিত্তিচিত্রে অলংকৃত। কথোপকথনের অবকাশকে প্রাধান্য দিয়ে এই বাড়ির রূপ এক বিরল উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথ কখনওই দীর্ঘদিন একই বাড়িতে থাকা পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারেও তিনি বৈচিত্র্য পিয়াসী। তাঁর স্বপ্নের সার্থক রূপ দিয়েছিলেন সেই সময়কার আশ্রমের বেশ কিছু মননশীল সহকর্মী।

১৯১৯ থেকে ১৯২৮ -র মধ্যে ধাপে ধাপে তৈরি হয়েছিল 'উদয়ন বাড়ি' (উত্তরায়ণ পরিসরে)। আর্থিক সমস্যার জন্য এই বাড়ি কখনই একেবারে তৈরি সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই 'উদয়ন-এ' কোনও অসামঞ্জস্য দেখা যায়নি। শান্তিনিকেতন দিগন্তের আনুভূমিকতাকে মনে রেখেই এই স্থাপত্যে আনুভূমিকতাকে মনে রেখেই এই স্থাপত্যে আনুভূমিক বিস্তারই প্রাধান্য পেয়েছিল বেশি। এই বাড়ির ওঠানামা ও এগিয়ে পিছিয়ে যাওয়া এক ভাস্কর্যের আবেদন নিয়ে এসেছিল। সূর্যের আলোর রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে এই আবেদন স্থাপত্যের ভাষার সঙ্গে মেলে। সুরেন্দ্রনাথ কর যেহেতু ছিলেন চিত্রশিল্পী, তাই তাঁর স্থাপত্যে কিছু চিত্রগত গুণও আমরা পাই। প্রকৃতির সঙ্গে চিত্র ও ভাস্কর্যের সমন্বিত এক রূপ। কবি তাঁর ভাবনা অবকাশ ও বিস্তারকে স্থাপত্যের গতির সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন এক অদ্ভুত একাত্মতায়। তাই অনেক সময়ই তৈরি করেছিলেন তাঁর স্বপ্নের স্থাপত্য। প্রতিমা দেবীকে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়ছে কবি নামকে ছাপিয়ে। থেকে থেকে মনে আসছে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে। শালবনের ছায়ায়— খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে, তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার দেওয়ালের উপর — জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকছে সমস্ত দুপুরবেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়া - বীথি চলে গেছে — কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে, জারুল পলাশ মাদারে চলেছে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুলি দুলছে হাওয়ায়; অশখগাছের পাতাগুলো ঝিলমিল ঝিলমিল করছে— আমার জানালার কাছ পর্যন্ত উঠেছে চামেলি লতা। নদীতে নেবেছে একটি ছোটো ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো - তারই এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার ঘাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটি মাত্র আছে আরাম কেদারা— মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বাসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পূর্ব দিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে নীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, আপন মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটীরে তার বাসা— যখন খুশি সেই গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাব। তার স্বামী ভালো মানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশ কালে সাহিত্য - আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে— নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো— সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে জুঁই, বেল, রজনীগন্ধা, রক্তকরবী। নদীর মাঝে - মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাসছে রাজহাঁস - আর ঢালু নদীতটে চ'রে বেড়াচ্ছে আমার পাটল রঙের গাই-গোরু, তার বাছুর নিয়ে, শাকসবজির খেত আচে, বিঘে - দুইয়েক জনিতে ধানও কিছু হয়, খাওয়া দাওয়া নিরামিষ, ঘর - তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট—রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়ছে আমি বার্লিনে — বড়োলোক সেজে — বড়ো কথা বলতে হবে — বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন— জগৎজোড়া সব সমস্যা রয়েছে তর্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ওদিকে ভারত সাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী তার অনেক দায়—ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। কতদিনই বা বাঁচব— ইতিমধ্যে কর্তব্য করতে করতে ঘোরা যাক— রেলে চ'ড়ে, মোটরে চ'ড়ে, জাহাজে চ'ড়ে, ব্যোমযানে চ'ড়ে— সভ্যভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই।' ইতি বাবামশায়/ ১৮ আগস্ট, ১৯৩০।[৯]

এই উদয়ন বাড়ির পাশেই আছে প্রতিমা দেবীর স্টুডিও ও রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুহাঘর 'চিত্রভানু'। স্বপ্ন ও বাস্তবের মেলবন্ধন এই অবকাশ স্থল। উদয়ন বাড়ির এক তলায় প্রধান কক্ষে কাঠের সিলিং ও কাঠের স্তম্ভের সঙ্গে কিছুটা ভারতীয় বৌদ্ধ গুহার (অজন্তা ও ইলোরা) মিল পাওয়া যায়। আবার মধ্যিখানে জায়গা ও তাকে চারদিকে প্রদক্ষিণ করার জায়গা কিছুটা হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহের মতো। একতলার আভ্যন্তরীণ কাঠের নকশা জাপানি চা পরিবেশনের ঘর ও তার অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা এবং অলংকরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে কাঠ কখনই কংক্রিটের থেকে আলাদা নয় ও এক ধ্যানগম্ভীর পরিবেশের উপস্থাপনা।

[৯]নির্বাণ; প্রতিমা ঠাকুর; বিশ্বভারতী; আষাঢ় ১৪০১, পৃঃ ১০-১১।

রবীন্দ্রনাথের বড় ঘর বা বাড়ি কখনই পছন্দ ছিল না। যে কারণে 'উদয়ন' -এ ছোট একটি ঘর (উত্তর দিকে) তৈরি করা হয়েছিল ও তাঁর সেই ঘর বেশ পছন্দেরও ছিল। রাণী মহলানবীশকে সে কথা জানিয়ে ছিলেন এক চিঠিতে:

'আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সে কথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোট ঘর। এই রকম ঘর আমি ভালবাসি তার কারণ তোমাকে বলি, ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে, তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড্ড বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোট ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছু নেই। সেখানে খাট আছে, টেবিল আছে, চৌকি আছে, সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত করে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাইনে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে, বাইরে —পূর্ণভাবে, বিশুদ্ধভাবে। দেওয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে অমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানালার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া। সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে— বেশ লাগছে।'[১৩]

এই উদয়নে কিছু কাল বসবাসের পর কোথাও তিনি নতুনভাবে অবকাশকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাই এই বাড়ির পাশে তৈরি হয়েছিল নতুন এক কুটির 'কোনার্ক'। উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে তাঁর কোনার্ক বাড়ি পর্ণকুটির থেকে নানা সময় নানা রূপ নিয়েছিল। এই বাড়িও একবারে তৈরি হয়নি। কাঁকড় পেটানো মেঝে, মাটির দেওয়াল ও দরমার বেড়া এবং খড়ের চাল সহ কোনার্ক বাড়ির মূল আদল তৈরি হয়েছিল। এর কক্ষের ছাদ ও মেঝেগুলি একই তলে নয়, সর্বত্র ওঠানামা রয়েছে। সব মিলিয়ে চৌদ্দটি ছাদ রয়েছে এই বাড়িতে। এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে বসার ব্যবস্থাও (হয়তো একবারে তৈরি হয়নি বলেই)।

স্থানীয় মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশিয়ে ১৯৩৪ 'চৈত্য' নামে একটি প্রদর্শন কক্ষ তৈরি হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ করের তত্ত্বাবধানে। শিশিরকুমার ঘোষ, রোসলি (জাভার ছাত্র) ও রামেশ্বর প্রসাদ শুক্লাও যুক্ত ছিলেন এই নির্মাণে। মূল পুরকল্পনা ছিল নন্দলাল বসুর। সেটির প্রেরণায় একই উপাদানে রবীন্দ্রনাথ একটি বাড়ি তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং যা তৈরির আগেই নাম দিয়েছিলেন 'শ্যামলী'।

[১০]পথে ও পথের প্রান্তে ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী; আষাঢ় ১৩৮৭, পৃঃ ৫২।

আর 'শ্যামলী' যে মাটির হবে তা বোঝা যায় তাঁর এই কবিতা থেকে: আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি/ বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে/ তার নাম দেব শ্যামলী।/ ও যখন পড়বে ভেঙে/ সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মত,/ মাটির কোলে মিশবে মাটি/ ভাঙা থামে নালিশ উঁচু করে/ বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে/ ফাটা দেওয়ালের পাঁজর বের করে/ তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না/ মৃতদিনের প্রেতের বাসা। ১৯৩৫-এ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে এই বাড়ির গৃহপ্রবেশ হয়। এর নির্মাণ কাজ চলাকালীন কবি অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এই আশ্রমে আমি কালে কালে নানান ঘরে বাস করে এসেছি— কোথাও স্থায়ী হতে পারিনি। মাটির ঘর তৈরি আরম্ভ হয়েছে। মর্ত্যলোকে ঐটেই আশা করছি আমার শেষ বাসা হবে। তারপর লোকান্তরে। এই মাটির ঘরটাকেই অপরূপ করে তোলার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা। ইঁট পাথরের অহঙ্কারকে লজ্জা দিতে হবে।'[১১]

এই শ্যামলীতে চৈত্যের প্রভাব ছিল, আর মধ্যিখানের ঘরকে প্রদক্ষিণ করার পথও ছিল। যা হিন্দু মন্দিরের প্রভাব। আবার উন্মুক্ত আঙ্গিনা বাংলার মাটির কথাও মনে করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে পরম্পরার প্রভাব থাকলেও তা অন্ধ অনুকরণ নয়। তবে তৈরি পদ্ধতি নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। কেউ বলেন, দেওয়ালের ভিতর মাটির হাঁড়ি ছিল, আবার কেউ বলেন ছিল না। কিন্তু রিটেনিং দেওয়ালে প্রয়োগের ভিত্তি আজও বর্তমান। প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা হানযুগের টালির ওপর ছাপচিত্র পাওয়ায়, যার সঙ্গে শ্যামলীর সম্মুখবর্তিতার এক দৃশ্যগত মিল বর্তমান।

এই বাড়ি তৈরিতে স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাজে লাগানো হয়েছিল যাতে তারা এমন নির্মাণ আজও করতে পারে তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে। শ্যামলী বাড়ি শিল্পকলা এবং স্থাপত্যের এক সমন্বিত ঝংকার। বাড়ির চারদিকে ও দোরগোড়ায় নন্দলাল ও রামকিঙ্করের রিলিফ অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। ঐতিহাসিক ও দৈনন্দিন চিত্র রিলিফে করা হয়েছিল। বসার ঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি মিলিয়ে পাঁচশো বর্গ ফুটের এই বাড়ি আজও স্থাপত্যকলার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

গৃহে বৈচিত্র্যভিলাষী রবীন্দ্রনাথ আবার পরের বছরেই (১৯৩৬) জমি থেকে সামান্য উঁচু ভিতে তৈরি করিয়েছিলেন 'পুনশ্চ'। শ্যামলীর পূর্ব দিকে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় বাড়ির পূর্ব দিক ঘেরা হল কাঁচ দিয়ে, পশ্চিম দিকে উঠল দেওয়াল। কোনার্ক -এর মতো 'পুনশ্চ' -র রূপ পালটালো ধাপে ধাপে। শ্যামলীর মতো রিটেনিং দেওয়ালের প্রয়োগ করা হয়েছিল। অব্যস্তির প্রধান কক্ষের ছাদ একটু বেশি উঁচু, যাতে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা চিল। কিন্তু বাদবাকি ছাদ বেশ নিচু এবং সামগ্রিক উচ্চতাও 'পুনশ্চ'র বেশ নিচু। সব মিলিয়ে কিছুটা 'শ্যামলী'র আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। কবির শেষ বাড়িগুলি যেন মাটির খুব কাছাকাছি— যেন মা-মাটির কাছে থাকার এক অদম্য বাসনা। 'পুনশ্চ'র পাশে আশ্রমে কবির শেষ বাড়ি 'উদীচী'। ছোট্টদোতলা

এই বাড়ির বৈশিষ্ট্য হল সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় বা বারান্দায় দাঁড়ালে কখনই মাটির সঙ্গে দূরত্ব বোধ হয় না। ভারতীয় পারম্পরিক অলংকরণের ব্যবহার ও এক কাব্যিক উপস্থাপনার অনুভূতি জাগায়। নিচতলায় বেশি সংখ্যার বড় বড় জানালা ও দরজার মাধ্যমে দেওয়ালের আবদ্ধতা মুক্ত করা হয়েছিল। দোতলায় ছোট্ট বারান্দা ও বসার জায়গা অত্যন্ত নিবিড় অবকাশের কথাই ব্যক্ত করে। এছাড়াও উত্তরায়ণ পরিসরে রথীন্দ্রনাথের গুহাঘরের আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা, প্রতিমা দেবীর ছোট্ট দোতলা স্টুডিওর বারান্দা, কোনার্কের পাশে মৃন্ময়ী বাড়ি, উদয়নের পেছনে জাপানি বাগান, কুয়োতলা, পাকশালার ধোঁয়া বেরনোর চিমনি, 'শ্যামলী'র সামনে তোরণের পরিকল্পনা প্রাচীন দর্শনের নির্যাস সম্বলিত এক আধুনিক চিত্ররূপের সামগ্রিক প্রকাশ।

রবীন্দ্রশতবর্ষে শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণে 'বিচিত্রা' বা 'রবীন্দ্র ভবন' সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছিল। এই বাড়িতে ঝুলন্ত বারান্দায় অলংকরণের মধ্যে বিজাপুরের প্রভাব পাওয়া যায় ও প্রধান প্রবেশদ্বারের সঙ্গে Aihole মন্দিরের দৃশ্যগত মিল পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে এই স্বপ্নের স্থাপত্য বাস্তবে রূপায়নের সূচনা বহু বছর আগে শুরু হয়েছিল কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। যদি থাকত, তাহলে হয়তো ভারতবর্ষের প্রাচীন পরম্পরা নতুন করে মূল্যায়ন হয়ে এক শুদ্ধ শৈলীর সৃষ্টি হত। যা হয়তো আজ স্থাপত্যকলার এক নতুন মাত্রা যোগ করতে পারত।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির অংশবিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয় উচিত হবে সেই যুগকে পর্যালোচনা করা বা সেই শিকড়ের সূত্রকে আবার ঘুরে দেখা : 'পাখি বাসা বাঁধে খড়কুটো দিয়ে, সে বাসা ফেলে যেতে তাদের দেরি হয় না; আমরা বাসা বাঁধি প্রধানত মনের জিনিস দিয়ে, কাজে-কর্মে, লেখা-পড়ায়, ভাবনা-চিন্তায় চারদিকে একটা অদৃশ্য আশ্রয় তৈরি হতে থাকে। হাওয়া গাড়ির গতি যেমন শরীরের মাপে টোল খেয়ে খোঁদলগুলি গড়ে তোলে; মনও তেমনি নড়তে চড়তে তার হাওয়া আসনে নানান আকারের খোঁদল তৈরি করে, তার মধ্যে যখন সে বসে তখন সে বসে যায়— তার পরে যখন সেটাকে ছাড়তে হয় তখন আর ভালো লাগে না।'[১১]

কবির স্থাপত্য চিন্তা মনের ভিতরে এক অদ্ভুত সুরের মতো বয়ে গিয়েছিল, যা কখনই সীমাবদ্ধ ছিল না শুধু মাত্র কয়েকটি বাড়িতে কারণ, সময় ও কাল ছাপিয়ে এই অস্তিত্বের আঙ্গিক, প্রত্যেক মুহূর্তে নিত্য নতুন প্রশ্নের উৎপত্তি ঘটিয়েছিল। প্রভাব পড়েছিল তাঁর ভিন্ন গান, নাটক, নৃত্যনাট্য, ছবি ও রেখার কাটাকুটির মধ্যে। বাড়ি বদল করার নেশা শুধুমাত্র বাড়ির মধ্যে নয়। এ বোধহয় তাঁর প্রত্যেক মুহূর্তে নিজেকে খোঁজা, আবার সেই আমিকেই দুর থেকে দেখা। 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা কবির আবদ্ধ জীবনের শুরু থেকে অসীম আকাশ, নদী প্রবাহ ও খোয়াই-এ ভেসে যাওয়ার দীর্ঘ প্রবাহকে এক সময়োত্তীর্ণ কাল্পনিক স্থাপত্যের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

'রক্তকরবী'তে রাজার বন্ধ প্রকোষ্ঠ বা 'ডাকঘর' নাটকে এক জানালার ফাঁক দিয়ে 'অমলের' বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে কবির স্থাপত্য ভাবনার ওঠানামা, প্রসারণও বিস্তারের বিমূর্ত রূপ। অন্যদিকে, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যে ভাবে বিভিন্ন স্তরের বিন্যাস বর্ণনা করা হয়েছে তা বোধহয় বাস্তবিক স্থাপত্যের থেকে কোনও অংশে কম নয়, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ভাষা এবং উপস্থাপনা, তার সঙ্গে দর্শকদের যোগাযোগ, যা সব সময়েই প্রকৃতি ও মানব অবয়বের যুগ্মরূপের অবকাশ। যেমনটি ঘটেছিল শান্তিনিকেতনের বহু বাড়িতে— ওঠানামা, আনুভূমিক বিস্তার ও প্রাচীন গুহাভিত্তিক মনোসংযোগের একক অবস্থান।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বাড়ি, প্রকৃতি ও গাছপালা উদ্ভিদ জগৎ ভিন্ন ঋতুতে নিত্য নতুন সুর ব্যক্ত করে। যার অনুভূতি কখনই এক হয় না। একে বোধহয় প্রত্যেক দিন অনন্তকাল ধরে অনুভব করা যায়। আর এই অনুভবই হয়তো ইতিহাসের সেই শক্তিকে বর্তমানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করাতে পারে। বিশ্বকে গ্রহণ করে, সংসারকে বিশ্বাস করাই হয়তো অনন্তের উপলব্ধি, যে বিশ্বাসের ভিত আজও বর্তমান আশ্রমের এই বাড়িঘরের শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে। যাকে অনুভব করার শক্তি একান্ত কাম্য।